Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.73-80
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রসংগীতের চিন্তনে ও মননে উপনিষদ্‌তত্ত্ব

অর্পিতা রায় চৌধুরী
সংস্কৃত স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The Upanishads are the last part of all the Vedas; hence the Upanishads are called Vedanta. Moreover, the Upanishads discuss the feelings of the last stage of life, such as renunciation, dispassion, etc. so the Upanishads are also called Vedanta in that sense. Upanishads were deeply practiced in Rabindranath's house. Hence, the teachings of the Upanishads deeply scarred his life. The profound philosophy of the Upanishads echoed in every melody of Rabindranath's music. As Rabindranath claimed to be a poet on the one hand, on the other hand he was a worshiper of spirituality. Happiness is one of the means of enjoyment in life. It is in search of this joy that Upanishad says- "Ānandamēba yadbibhāti"

He adopted Ananda Tattva from the theory of Upanishad and applied it in every aspect of life. Dive into that ocean of joy, the poet sang- "Aanondodhaara bohichhe bhubane". Now, let us come to the spiritual thoughts of Rabindragan which were the innermost pursuits of the sages of the Upanishads. In Isopanishad the sage says that God resides everywhere in the world. And God resides in all beings. Nothing in the world is permanent. One has to enjoy through sacrifice. Don't covet someone else's money. The feeling of our poet Rabindranath is no less than this. An echo of this can be heard in Rabindranath's songs. "Aamar je sob dite hobe se to aami jaani, Aamar jato bitto, probhu, aamar jat o baani. Aamar chokher cheye dekha, aamar kaaner shona, Aamar haater nipun seba, aamar aanagona-Sab dite hobe"

At the end of the discussion, I can say that Rabindranath's song is a symbol of life philosophy. This philosophy once ran through the veins of the sages. The influence of the feeling of that vision is mixed in Rabindranath's songs. But no matter where the philosophy of Rabindranath's music comes from, Rabindranath's music survives in its own originality. Rabindranath broke the traditional monotony in the world of music and made a new change in the life of music through Upanishad.

Keyword: Upanishad, Vedas, Vedanta, Rabindranath, Ānandamēba, philosophy, songs.

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
এ আগুন ছড়িয়ে গেল

সব খানে সব খানে সব খানে।"[1]

সভ্যতার বিবর্তনে জন্ম নেওয়া আদম ঈভই হোক বা বিশ্বায়নের দুনিয়ার হোমোসেপিয়েন্সই হোক, রক্তমাংসের বাইরে সবার একটা চিরন্তন মানবসত্তা আছে, যেখানে সে চিরকালীন একা, সেই একাকীত্বের সামিয়ানায় সে এক চিরন্তন সত্যকে হাতড়ে বেড়ায় প্রতিটি স্বপ্নে, প্রতিটি সাধনায়, মননের প্রতিটি টুকরোয়, এক অধরাকে ধরার রাজ্যে সে সুরের জগতে পেতে চায় এক অফুরন্ত আনন্দ। তাই সুরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরজনমের- "চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমিই চেনাবে সবে।"[2] সুরের প্রতিটি অনুরণনে মানুষ খুঁজে পাই তাঁর আপনসত্তাকে, তাইতো কালিদাস তাঁর 'শকুন্তলা'[3] নাটকে হংসপদিকার গানের অভ্যন্তরে স্মৃতির জাবর কেটেছেন মনের গোপনরাজ্যে আর সেই গান এক লহমায় আপনসত্তাকে টেনে নিয়ে গেছে জীবনের সেই পরিচিত সত্তায়। সেই আপনসত্তাই হল বেদান্তের ব্রহ্ম, ন্যায়ের আত্মা, সাধারণ মানুষের ভগবান। তাই পরমাত্মার সাথে চিরকালীন একত্বে মিশে যাওয়ার সাধনায় সুর যখন তালের সাথে ঘর বাঁধে আপন খেয়ালে তখনই তা সংগীতরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

জীবনের প্রভাতে অঙ্কুরিত অনুভূতিই হোক বা যৌবনের মধ্যগগনে শুষ্ক উপলব্ধিই হোক, সবই যেন রবীন্দ্রমননের ললনায় উজ্জীবিত হয়ে যায়, সেখানে যেন রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে অঙ্গ আর ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে ছাড়া। ভাব ও রূপের খেলাঘরে কবি আমাদের বেঁধে রাখেন তাঁর সুরের গভীরতায়। উপনিষদ্‌গন্ধী কবির চিন্তনে ও মননে বেদান্ততত্ত্ব মিশে আছে অন্তরঙ্গভাবে। উপনিষদ্‌ঋষির অনুভূতি দার্শনিক কবির অনুভূতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যে অনুভূতির পরোতে পরোতে কখনো বেদান্তের অদ্বৈতবাদ[4], কখনো ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে জীবনরহস্যের সমাধান খুঁজেছেন কবি। রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরালে নিমজ্জিত দর্শনের বিশ্লেষণ করা আমার মতো স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের বোধবুদ্ধির বাইরে। তাই কোনো অহংকার বা ধৃষ্টতা না দেখিয়ে রবীন্দ্রগানের মননে কিভাবে উপনিষদ্‌তত্ত্বে আমরা স্নাত হই, তাই-ই আমার বর্তমান পত্রের উপজীব্য।

রবীন্দ্রগানের ধারা: কবির সংগীতচেতনা মুলত যে চারটি বিষয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত সেগুলি হল- উপনিষদ্‌, সংস্কৃতসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য ও বাউলদর্শন। ঠাকুরবাড়ি ছিল ঔপনিষদিক ভাবনায় পুষ্ট, ঠাকুরবাড়ির আনাচে কানাচে উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতো । **তাই** রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই সেই ঔপনিষদিক ভাবনায় স্নাত হয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যে, প্রবন্ধে, গল্পে **ও** কবিতায় যেমন উপনিষদের প্রভাব পড়েছে, তেমনি সংগীতের বুননেও উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা সাবলীলভাবেই মিশে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের গানে একদিকে যেমন উপনিষদের প্রভাব লক্ষনীয় তেমনি অন্যদিকে তার গানের সুরে ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতের ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা, তরানা, ভজন ইত্যাদি ধারার সুর এবং সেইসঙ্গে

[1] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১১০ পৃষ্ঠা।

[2] Gitanjali Song Offerings, Rabindranath Tagore, Society For Natural Language Technology Research, Page No-190.

[3] খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক।

[4] এক ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সকলের মধ্যেই বিরাজিত এই তত্ত্ব 'অদ্বৈতবাদ'।

বাংলার লোকসংগীত, কীর্তন, রামপ্রসাদী, পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সংগীত ও পাশ্চাত্য লোকগীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবির এহেন সঙ্গীতপ্রীতি ও সঙ্গীতশিক্ষার নেপথ্যে অবদানের শীর্ষে ছিলেন তার সংগীতগুরু যদুভট্ট।

যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের প্রায় গানই 'গীতবিতান' নামক সংকলনগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গানগুলিকে 'পূজা', 'স্বদেশ', 'প্রেম', 'প্রকৃতি', 'বিচিত্রা' ও 'আনুষ্ঠানিক'–এই ছয়টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। কবির পুজা পর্যায়ের গানগুলি বিশেষ অধ্যাত্মচেতনায় পুষ্ট। অপরদিকে বিবেকবোধ ও প্রেমের অনুভূতি ধার করে তিনি রচনা করেছেন তাঁর প্রেমপর্যায়ের গীতিযুগল। তাই তাঁর সমস্ত পর্যায়ের গানে উপনিষদের প্রভাব না থাকলেও পূজা, প্রেম, প্রকৃতি পর্যায়ের গানে উপনিষদের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর রচনায় পূজা-প্রকৃতির গান যেন একাকার হয়ে গেছে।

বেদান্তসারের তত্ত্ব: বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে মানবমনের অন্দরমহলের মানবিক সমীকরণই হল উপনিষদ। গুরুদের চোখে চোখ রেখে শিষ্যরা সেদিন হাজারো প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিল ঋষিদের জবানবন্দীতে। **হয়তো** সেদিন বেদান্তের জাকজমকপূর্ণ সংজ্ঞা মানুষ জানতো না, কিন্তু মানবমন অনবরত যেভাবে মানবিকতার ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে তা বেদান্তেরই নির্যাস। সময়ের দাবিকে সম্মান জানিয়ে বহু সাধক বেদান্তের ব্যাখ্যায় নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করেছেন যুগে যুগে। কখনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কখনো বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বেদান্তের অনুভূতি পূর্ণ হয়েছে বারে বারে। কোনো সাধক তাত্ত্বিক জীবনে বেদান্তের উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়েছেন আবার কেও ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্তবাণীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তবে যিনি জীবনদর্শনকে বেদান্তত্ত্বের আলোয় উপভোগ করেছেন তিনি উপনিষদগন্ধী কবি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রগানের মূল সুর: রবীন্দ্রসংগীতের মূল সত্তা উপনিষদ্‌তত্ত্ব বা বেদান্ততত্ত্ব। প্রকৃতির ক্রোড়ে উৎসারিত এক অফুরন্ত আনন্দবোধ সুরের আকাশে রবিকে মাতাল করেছিল। রামকৃষ্ণের ন্যায় সংসার থেকে দূরে নয়, সংসারের মধ্যে থেকেই এক অফুরন্ত আনন্দবোধ কুড়িয়ে কবি সুরের জগতে পা দিলেন। তারপর ভাবনাগুলো যেন গুঁটি গুঁটি পায়ে পথ চলেছে অনুভূতিকে সাক্ষী রেখে। কবির ভাবনায়–"সমস্ত মানব জীবনও অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত।"[5]

কারো মতে রবীন্দ্রনাথ বারো বছর বয়সে গান রচনা করেন, আবার কেও বলেন চোদ্দ বছর বয়সে গানের বর্ণপরিচয়ের সাথে কবির আলাপ হয় । তবে রবীন্দ্রনাথ যে বয়সেই গান রচনা করুন না কেন বাল্যকাল থেকেই উপনিষদের চিন্তাধারায় তাঁর বেড়ে ওঠার ফলে তাঁর একাধিক গানে উপনিষদ্‌চিন্তা প্রতিফলিত। বাল্যকাল থেকেই তিনি পিতার উপাসনার বেদমন্ত্রে দীক্ষিত, "যঃ আত্মদা বলদা", "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।"[6] -এরূপ নানাবিধ স্তোত্রপাঠেও সুরারোপ করতেন। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের গান এবং উপনিষদতত্ত্ব যেন একই বৃন্তে দুটি কুসুম। কবির সমগ্র জীবনদর্শনের উপলব্ধির আলেখ্য যেন তাঁর গানের সুরে ও ছন্দে উদ্ভাসিত, যে সুর উপনিষদের তত্ত্বে জন্ম হয় তা তাঁর সংগীতের বাড়ন্ত বেলায় ফুলে ফলে মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

অদ্বৈতজগতে রবীন্দ্রনাথ: জগৎসংসারের গতিশীলতায় অবিরত নানাবিধ কর্ম সম্পাদিত হয়ে চলেছে। প্রকৃতির খেলাঘরে অনবরত ঘটে চলেছে নব নব সৃষ্টি। সেই ব্যস্তময় প্রকৃতির মাঝে কোনো সরল, অবুঝ,

[5] রবীন্দ্রগানের অন্তর্জগত, সুশীল কুমার বিশ্বাস, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৫।

[6] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্-৬/৭।

অজ্ঞ ব্যাক্তিকে ছেড়ে দিলে সে দিশাহারা হয়ে পড়বে, ঠিক যেমন কোনো এক ব্যস্ত চিনির কারখানায় যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় যিনি কারখানা সম্পর্কে অবগত নন, তিনি যখন দেখবেন সেখানে বড় বড় মেশিন, কোথাও বড় চৌবাচ্চা, আবার কোথাও দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন তখন তিনি অনুমান করবেন পৃথিবী বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত। কিন্তু তিনি এই সত্য অনুধাবনে অক্ষম হবেন যে, এগুলি কোনো পৃথক বিশেষ কার্য নয়, ইহা চিনি তৈরির বিবিধ পদ্ধতিমাত্র। আবার স্বর্ণও বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা কখনো কানের ভূষণরূপে, কখনো বা বলয়াদিরূপে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ চিনির কারখানা হোক বা সোনার বলয়াদি সবখানেই মূলসত্তা থাকে অভিন্ন, ভিন্নরূপে প্রকাশ হয় মাত্র। ইহা হইতেই স্পষ্ট হয় যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। উপনিষদ্‌মতে জগতের স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল কিছুর মধ্যে এক ঈশ্বর বিদ্যমান-"ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্।" বেদান্তের সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের আলেখ্যরেখায় ধরা পড়েছে। কখনো তার কণ্ঠে শোনা গেছে "আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখিতে আমি পাই নি।"[7] জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবার কখনো শোনা গেছে-

"তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই,
বারে বারে নূতন লীলা তাই।"[8]

উক্ত গানের অন্তরালে কবি দেখিয়েছেন এক চরম সত্য, যে সত্য আমি তুমি সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে হাত বাড়ায়, যে সত্য মিথ্যার আবরণ সরিয়ে সত্যস্বরূপ হিরণ্ময়পাত্রের সন্ধান দেয়, সেই সত্যই উপনিষদের ব্রহ্ম, যা কবি তার জীবনের প্রতিটি উপলব্ধির মধ্যে খোঁজ করেছেন। উপনিষদের সেই পরম সত্তাকে কবি দেখেছেন আপন সত্তার অন্তরালে, কবির সৌন্দর্যভাবনায় সেই আপনসত্তা যেন 'চেতনার রঙে পান্না' হয়ে ধরা দিয়েছে। কবি আপনসত্তাকে অস্বীকার করে জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। জগত ও জীবনের নির্যাসকে স্বীকার করে কবি লিখেছেন-

"আমায় নিয়ে মেলেছে এই মেলা
আমার হিয়ায় চলেছে রসের খেলা
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা ভরঙ্গিছে।"

উপনিষদ্‌মতে সৃষ্টির কারণ দ্বিবিধ-নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। সেই অর্থে ব্রহ্ম হলেন সৃষ্টির উভয়কারণ। তিনিই সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি একাধারে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ আবার মাকড়সা যেরূপ জাল বুনে নিজেই সেই জালে প্রবেশ করে, সেরূপ ব্রহ্মও জীব সৃষ্টি করে জীবাত্মার মধ্যেই বিরাজ করেন, সেই অর্থে তিনিই সৃষ্টির উপাদানকারণ। তাই বলা যায় একটি বোতল বা কলম সবকিছুর মাঝেই ঈশ্বর বিরাজমান। প্রশ্ন হতে পারে তবে কলমের মধ্যে ঈশ্বর দৃষ্ট হননা কেন? তার উত্তরে বলতে পারি মায়া বা অহংকারের কারণবশত। রাসলীলায় গোপীরা দেখছেন সর্বত্র কৃষ্ণের উপস্থিতি, অথচ কৃষ্ণ আছেন তার রাধার নিকট। অর্থাৎ গোপীগণ মায়াবশত চারিপাশে কৃষ্ণকে দেখছেন, ইহাই বেদান্তের মায়াবাদ। এবিষয়ে কবি বলছেন– "এবার, সখী সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা।"[9] তবে উপনিষদ্‌ঋষির মতো জগতকে মায়া বলে উড়িয়ে দেননি কবি। রূপ রস গন্ধে ভরা জগতকে উপভোগ করতে চেয়েছেন কবি। তাই তিনি

[7] গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী-পৃষ্ঠা-৫০।
[8] গীতাঞ্জলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-১৩৪ ।
[9] গীতবিতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী-পৃষ্ঠা-৩৪৮।

বলেছেন "বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে, সে স্বপন কাহার স্বপন?" তবে উপনিষদের অদ্বৈতবাদকে তিনি অস্বীকার করেননি, মানুষের মধ্যে পরমসত্তাকে স্বীকার করে তিনি অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন, যা তার সঙ্গীতের পরোতে পরোতে ধ্বনিত।

রবীন্দ্রগানে আনন্দতত্ত্ব: মানবজীবনে নিয়ত কর্মের স্রোত প্রবাহিত হয়। দিনভর মানুষ কোনো না কোনো কর্মে লিপ্ত থাকে, বিরাম নেই ক্ষণিকও। সেই কর্মস্রোতের ধারা তিনটি-জ্ঞানকর্মের ধারা, যে ধারায় মানুষ দেখে বা শোনে, অনুভূতিকর্মের ধারা, যে ধারায় মানুষ সুখ-দুঃখ প্রীতি-বিদ্বেষ অনুভব করে এবং ইচ্ছাধীন কর্মের ধারা, যে ধারায় মানুষের সকল কর্ম তার ইচ্ছার অধীন। এখানে একাধিক বিকল্প কর্মের ভিড়েও মানুষ একটি কর্মকে বেছে নিতে সক্ষম হয়। চরুইভাতি করতে যাওয়া এবং অসুস্থ আত্মীয়ের প্রয়োজনে যাওয়া এরূপ দুটি কর্মের দ্বন্দ্বে মানুষ কোনটি বেছে নেবে সেটি তার ইচ্ছাধীন। গন্তব্যস্থান স্থির না করে পথ চলা শুরু করা মূর্খামি। বিকল্পের মাঝে নিজের নৈতিক লক্ষ্য স্থির রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই দেহ ও মনের চুলোচুলিতে ইন্দ্রিয়ভোগ মানুষের নীতি হওয়া শ্রেয় নয়, মহত্ত্ব ত্যাগে। যে ত্যাগে অসীম ও সসীমকে এক করে কবি অনুভব করেন-

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"[10]

রবীন্দ্রনাথ যতকাল বেঁচে ছিলেন বা যতকাল সুরের ঝংকারে রবীন্দ্রজীবন আবর্তিত হয়েছিল, ততকাল আনন্দতত্ত্ব তাঁর গানে ও কথায় ধরা পড়েছে। আনন্দই জীবনের মুখ্য উপাদান। নিরানন্দের কারাগারে বন্দী থেকে কখনো জীবনকে উপভোগ করা যায় না। উপনিষদ্ বলছেন- "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিদানি ভূতানি জায়ন্তে"[11] অর্থাৎ আনন্দ থেকেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়। রবীন্দ্রগানেও এই দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে বারে বারে। তাই তিনি কখনো গেয়েছেন-"আমার মুক্তি আলোয় আলোয়"[12] তখন মুক্তির চরম স্বাদ আনন্দতত্ত্বেই প্রতিফলিত হয়, আজকের চরম দুর্দশার দিনে যখন আমরা নিরানন্দের কারাগারে বন্দী তখন গ্রামোফোনে ভেসে আসা রবীন্দ্রসঙ্গীত যেন আমাদের সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। জীবনের সেই চরমতম দুঃখের দিনে উপনিষদের রসবোধকে সংগীতের মধ্য দিয়ে ভোগ করেছেন কবি।

বিবেকবোধের আলোয় রবীন্দ্রগান: বিবেকবোধ উপনিষদের আর এক সম্পদ, এই বিবেকবোধের তাড়নাই উপনিষদগন্ধি ঋষিরা বারে বারে মানবিকতার দরজায় কড়া নেড়েছেন, কখনো সমাজের জন্য আত্মত্যাগ কখনো বা ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়ার দাবীতে সর্বস্বত্যাগ। বৈদিক ঋষিদের এই বিবেকবোধ রবীন্দ্রগানে অন্তরঙ্গ হয়ে আছে। তাই কখনো তিনি গীতাঞ্জলীর পাতায় লিখছেন-"আমার মাথানত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।"[13] আবার কখনো তার কণ্ঠে শোনা গেছে-

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখিতে আমি পাইনি।"[14]

[10] গীতাঞ্জলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২০ সংখ্যক কবিতা।
[11] "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-৩/৬ ।
[12] গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৩৩৯।
[13] গীতাঞ্জলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-১২।
[14] গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৫০।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিবেকবোধের মূর্ত প্রতীক। সেই বিবেকবোধের দৌলতেই সারা বিশ্বের অনুভূতিকে তিনি এক ছাদের তলায় এনেছিলেন, পূজা পর্যায়ের সুরের লালনায় যে অভাব স্পষ্ট।

প্রেম ও রবীন্দ্রগান: রবীন্দ্রগানের আর এক রসদ প্রেম। প্রেমের জন্যেই প্রকৃতি, প্রেমের জন্যই আশা নিরাশার মরুভূমিতে ঘর বাঁধা। সেই প্রেমের নেশাতেই ঋষিরা যেমন ভোগের কারাগারে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছেন তেমনি ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসীও হয়েছেন। আবার কবি তো রাজকীয় সুরে গান বেধেছেন-

"তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।"[15]

জীবনের মূল্য অনেক, প্রেমের পথেই সেই মূল্য রক্ষা করতে হয়। রবীন্দ্রসংগীতের ছত্রে ছত্রে যেন সেই প্রেমের অমোঘবাণী ঘোষিত হয়েছে। আবেগমিশ্রিত প্রেমের প্রলাপে কবি দেখিয়েছেন চরম সত্যকে। প্রিয়তমার আবেগকে খর্ব করে নয়, তাকে পরম আত্মীয় করে কবি উপনিষদের রসবোধকে যেন প্রেমে রূপান্তরিত করেছেন সুরের ঝংকারে।

রবীন্দ্রগানে আধ্যাত্মিক মোড়ক: রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন নিজেকে কবি বলে দাবি করেন তেমনি অন্যদিকে তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতার পূজারী। কবি হিসাবে তিনি রূপ রস গন্ধে ভরা জগতের রসবোধকে ভোগ করেছেন উপনিষদের "রস বৈ স:"[16] এর মাপকাঠিতে। আনন্দই জীবনের অন্যতম ভোগের উপকরণ। এই আনন্দের খোঁজেই উপনিষদ্‌ বলছেন- "আনন্দমেব যদ্বিভাতি।"[17] আবার সেই আনন্দসাগরে ডুব দিয়ে কবি গাইলেন-

"আনন্দধারা বহিছে ভূবনে।"[18]

সবশেষে আসি, রবীন্দ্রগানের আধ্যাত্মিকতায়। যা ঔপনিষদিক ঋষিদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলের আরাধনা। ঈশোপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত ঋষি বলছেন -

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধ কস্যস্বিদ ধনম্‌।"[19]

জগতের সবখানে ঈশ্বরের বাস। সকলের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান। জগত পরিবর্তনশীল। তাই কিছুই স্থায়ী নয়। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভোগ। অর্থাৎ যা পাও তাঁর প্রসাদ সবটাই। উপভোগ কর। অন্য কারো ধনে লোভ করো না। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি এর থেকে কোনো অংশে কম নয়। রবীন্দ্রনাথের গানে এরই প্রতিধ্বনি-

"আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী
সব দিতে হবে, সব দিতে হবে।
আমার চোখে চেয়ে দেখা, আমার কানে শোনা

[15] গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী -১৮৪।
[16] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌-২/৭।
[17] মুন্ডক উপনিষদ্‌- ২/২/৭।
[18] গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৩২৬।
[19] ঈশোপনিষদ্‌-১।

আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা
সব দিতে হবে ,সব দিতে হবে।"[20]

কলমের তুলির শেষ টানে বলতে পারি, রবীন্দ্রগান তো জীবনদর্শনের প্রতীক। যে দর্শন একদিন ঋষিদের শিরায় শিরায় বয়ে গিয়েছিল। সেই দর্শনের অনুভূতির প্রভাব রবীন্দ্রগানে মিশেল হয়ে রয়েছে। তবে রবীন্দ্রগানে দর্শন যেখান থেকেই আসুক না কেন, রবীন্দ্রসংগীত নিজস্ব মৌলিকতায় অম্লান। গানের ভুবনে প্রথাগত একঘেয়েমির বেড়াজাল ভেঙে রবি সঙ্গীতের জীবনে এক নব রূপায়ণ ঘটিয়েছেন উপনিষদতত্ত্বের হাত ধরে। অনুভূতির জোয়ারে ভারতীয় রাগাশ্রিত রবীন্দ্রগানের কুঁড়িতে কুঁড়িতে বিকশিত হয়েছে উপনিষদপুষ্প। আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিকের ক্ষুদ্র আয়াসে রবীন্দ্রসংগীতের সুরে উপনিষদতত্ত্বের সেই পুষ্প ক্ষুদ্র রেণু।

গ্রন্থঋণ

আকরগ্রন্থ:

1. উপনিষদ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৮তম মুদ্রণ, ২০১২।
2. গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২১, ISBN- 978-81-7522-009-6.
3. গীতিমাল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, মুদ্রন-১৯৪৬।
4. বেদান্তসারঃ, ডঃ কৃষ্ণ ধীবর সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০২১, ISBN- 978-93-81795-88-0.
5. সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, সংস্করণ- ১৪২১, ISBN- 978-81-7522-375-2.

সহায়কগ্রন্থ:

1. গোস্বামী, প্রভাতকুমার, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ-২০১১।
2. ঘোষ, শান্তিদেব, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা, আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ- ২০১৩, ISBN- 81-7066-604.
3. ঘোষ, শান্তিদেব, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিশ্বভারতী, মুদ্রণ- ১৪২১, ISBN- 978-81-7522-302-8.
4. ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২০০০, ISBN- 81-87259-02-07.
5. দে, কিরণশশী, রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মুদ্রণ- ২০১৪, ISBN- 978-81-295-2058-6.
6. দত্ত, দেবব্রত, সঙ্গীত তত্ত্ব(শাস্ত্রিয় তথা ভাব সঙ্গীত প্রসঙ্গ), প্রথম খন্ড, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা, সংস্করণ- ২০০৬।
7. প্রজ্ঞানানন্দ, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস(প্রথম ভাগ), শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ- ২০১১, ISBN- 978-93-80568-28-7.
8. বন্দোপাধ্যায়, কণিকা, রবীন্দ্রসঙ্গীত : কাব্য ও সুর, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, সংস্করণ- ১৯৯৬।
9. বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, ভরত নাট্যশাস্ত্র, নবপত্র প্রকাশন, তৃতীয় মুদ্রণ- ২০।
10. বন্দোপাধ্যায়, শ্রীনীলরতন, সংগীত পরিচিতি, উত্তর ভাগ, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ- ২০১৬।

[20] গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-১৯০।

11. বন্দোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ- ১৯৯৫, ISBN- 81-85325-18-9.
12. বন্দোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র, সঙ্গীতদর্শিকা(প্রথম খণ্ড), রামকৃষ্ণ আশ্রম, যাদবপুর, কলকাতা, সপ্তদশ মুদ্রণ- ২০১।
13. বিশ্বাস, সুশীলকুমার, রবীন্দ্রগানের অন্তর্জগৎ, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, প্রকাশ- ১৪১৬।
14. বিশী, প্রমথনাথ, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সংস্করণ- ২০১৪, ISBN- 81-89801-02-3.
15. মুখোপাধ্যায়, অমল, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ- ২০১২, ISBN- 978-81-8437-174-1.
16. Gitanjali, Rabindranath Tagore, Parul, Kolkata, Reprint- 2019, ISBN- 978-93-83413-28-7.
17. Gitanjali Song Offerings, Rabindranath Tagore, Society For Natural Language Technology Research, Kolkata, 2013.

পত্র-পত্রিকা:

১. উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১১৬ তম সংখ্যা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
২. উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা শারদীয়া সংখ্যা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
৩. দৈনিক স্টেটম্যান, (বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা) কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।